দুঃখ, জরা-মৃত্যু ইত্যাদি ভয়ে ভীত সংসার চিত্তকে শৃগাল তুল্য। এই চিত্তই যখন বিশুদ্ধ হয় তখন সজ্ঞানস্বরূপ সিংহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়, অর্থাৎ তা আয়ত্ত করবার জন্য ব্যাকুল হয়।

টেন্টণ পাদের এই গানের কোনো কোনো পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ লোক বুঝতে পারেন, সকলে বুঝতে পারেন না।

৪১.৬ সমাজ চিত্র

দেশ-কাল-সমাজকে দূরে রেখে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অন্তরের গভীরতায় ধর্মের নিবিড় উপলব্ধির-জগতে পৌঁছতে চেয়েছেন। চর্যাকারগণের দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্বের দিক থেকে ছিল জীবনবিমুখ। জগৎ জীবন মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের নানা লৌকিক রূপের উপরই বেশি নির্ভর করেছেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে জীবনকে স্বীকার করলেও পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই চর্যাপদে আমরা সমাজ ও জীবনের রূপচিত্র পাই তা পরোক্ষ-খণ্ডিত ও আভাস ইঙ্গিতময়। সিদ্ধাচার্যগণ অমূর্ত উপলব্ধিকে রূপ দিতে গিয়ে নানা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন নদীমাতৃক বাংলাদেশের লোকজীবন থেকে।

বাংলাদেশে সেন রাজাদের যখন আধিপত্য, তখনই চর্যার গানগুলি রচিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজাগণ পরধর্মে অসহিষ্ণু ছিলেন। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত আর বেদধর্ম ও বেদাচারের বাইরের জনগোষ্ঠী ছিল অস্পৃশ্য অন্ত্যজ। এই তাত্ত্বিক ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে চর্যাপদ রচিত।

চর্যাগীতির রচয়িতাগণ ডোম্বী, কামলি, শবর ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণির লোক এবং চর্যাগীতির ডোমনী, শবর, চণ্ডালী, ব্যাধ, জেলে, ধুনুরী ইত্যাদি পাত্র-পাত্রীও অস্পৃশ্য শ্রেণির। সামাজিক বিভাজনের স্পষ্ট রূপরেখা কাহ্ন পাদের চর্যাগীতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সে ব্রাহ্মণ নাড়িআ।"

উচ্চবর্ণের লোকেরা নগরে বাস করতো, আর ডোম, শবর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকজন নগরের বাইরে—জনপদ থেকে বহুদূরে পাহাড়ে, জঙ্গালে মালভূমিতে বাস করতো। এদের স্পর্শে ব্রাহ্মণ্য সমাজ যাতে কলুষিত না হয় সেজন্যই শ্রেণি বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা। মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপকরূপে—ডোমনী, শবরী ইত্যাদি নারী চরিত্র চিহ্নিত হয়েছে। এই রূপক ব্যবহারের মধ্যেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্পর্শ যোগ্যতার ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্ত্যজ শ্রেণির আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। নানা বৃত্তিনির্ভর নিম্নবর্ণের জীবনচিত্র সজীবরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ডোম, ব্যাধ, শুঁড়ি, তাঁতী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর জীবন্ত-জীবিকা প্রকাশে তাঁত বোনা, চাঙ্গাড়ি তৈরি করা, খেয়া পারাপার করা, শিকার করা ইত্যাদির পরিচয় আছে।

ডোম্-ডোমনীর নৌকা বাওয়া, নদী-নালার বুকে সেতু তৈরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নদীবক্ষে ডাকাতি ইত্যাদির বর্ণনায় নদী ও নৌকা প্রসঙ্গ আছে। ৫ সংখ্যক পদে চাটিল্লপাদ বলেছেন—

"ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী।।

দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।।"

এর সঙ্গে 'সাঙ্কম গঢ়ই'ও আছে। নদী পারাপারের পারিশ্রমিক রূপে যৎসামান্য 'কড়ি' বা 'বুড়ি' ডোমজাতি পেতো। ডোম পুরুষেরা কাপালিক বেশে পায়ে নূপুর ও কানে কুণ্ডল পরে নাট্যগীতি করেও অর্থ উপার্জন করতো। এছাড়া মদ চোলাই করা (৩), শিকার করা (৬,২৩) কাঠের কাজ করা (৫,৪৫), তুলা ধোনা, মোটা কাপড় বোনা (২৬,২৫) ইত্যাদি কাজেও অন্ত্যজ শ্রেণি যুক্ত ছিল।

আপনাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ৫ সংখ্যক পদে নৌকো পারাপার, সেতু নির্মাণের কথা আছে।

'পার গামিলোঅ নিভর তরই' 'ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ'—ইত্যাদি চরণ এর দৃষ্টান্ত। ভুসুকুপাদের ৬ সংখ্যক পদে হরিণ শিকারের বাস্তব বর্ণনা—

'কাহেরে যিনি মেলি অচ্ছ হু কীম।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।।'

দারিদ্র্যলাঞ্ছিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন চিত্র টেন্টণপাদের ৩৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়।

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি, নিতি আবেশী।।"

পেটের জ্বালায় কেউ কেউ পদ্মের ডাঁটা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। কেউ বা অভাবের তাড়নায় চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হতো চুরির ভয়ে ঘরে তালা লাগানোর কথাও আছে।

৩৩নং পদে এর দৃষ্টান্ত আছে।

"জো সো চৌর সৌ দুষাধী।" এছাড়া ২,৩৮,৪৯ সংখ্যক চর্চা গীতিতেও চুরি ডাকাতির প্রসঙ্গ আছে। চর্যায় গার্হস্থ্য জীবন যাপনের জীবন্ত চিত্র আছে। যৌথ পারিবারিক কাঠামো দেখা যায়। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-শালী-স্ত্রী-পুত্রবধূ (বহুড়ী) নিয়ে যৌথ সংসার। স্বেচ্ছাচার ছিল না। গৃহবধূ শাশুড়ীকে ভয় পেতো। এছাড়া নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় আছে—যার সঙ্গে আধুনিক বাঙালী সমাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনায় এর পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাহ্নপাদের ১৯ সংখ্যক পদে বিবাহ যাত্রার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

"জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।।"

শবর পাদের ২৮ ও ৫০ সংখ্যক চর্যায় আদিবাসীদের দাম্পত্য জীবনের স্পষ্ট চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে প্রমোন্মত্ত শবর-শবরীর মিলনসুখের পাশাপাশি মান-অভিমানের চিত্রও আছে। ২৮ সংখ্যক পদে দেখা যায় ভুলের অবসান হলে উন্মত্ত শবরকে শবরী অনুনয় করে বলে—

"উমত সবরো পাগল শবরো মাকর গুলী-গুহাড়া তো হৌরী।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।"

ব্যবহারিক জীবনে হাঁড়ি, ঘড়া, গাড়ু ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। মেয়েরা আয়না, কাঁকন, কুন্তল ইত্যাদি ব্যবহার

করতো। ধনী ব্যক্তিরা খাটে শুয়ে কর্পূর মেশানো পান খেতো। সমাজ জীবনে মদের আসক্তি ব্যাপক ছিল। যার ফলে মদ চোলাইয়ের ব্যবসা রমরমা ছিল। বিরুআর ৩ সংখ্যক চর্যায় শুঁড়িবাড়ির বিশেষ বর্ণনা আছে।

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত রাগ-রাগিনীর নাম, বাদ্যযন্ত্র ও নাচগানের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়—চর্যার যুগে নাচ-গানের প্রাধান্য ছিল। কাহ্নপাদের পদে নাচ-গান ও নাটকের কথা আছে।

"একসো পদুমা চৌসঠ্ঠী পাখুড়ী।
তাই চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুধ্ব নাটক বিসমা হোই।"

নাটগীতির পালায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করতো।

সব দিক থেকে আলোচনা শেষে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি সাধক কবিগণ অধ্যাত্মপথের যাত্রী হয়েও সমাজ জীবনের মূল স্রোত ধারার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছিলেন, তার জন্যই বাংলার প্রান্তিক-ভূখণ্ডের জীবন্ত সমাজ চিত্র চর্যাগীতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

৪১.৭ অধ্যাত্ম ভাবনা

চর্যাগীতিতে যে ধর্ম সাধনার ইঙ্গিত আছে, তা প্রধানত সহজযান বৌদ্ধধর্মের। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গুহ্য সাধন সংকেতই রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। মহাযান মতবাদ বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজ যান ইত্যাদি নানা ভাগের সৃষ্টি।

বজ্রযানীদের মতো মন্ত্র-তন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনা, পূজা-আচার অনুষ্ঠানে সহজযানীদের বিশ্বাস ছিল না। গুরু নির্দেশিত গুহ্যপথ ধরে কায়া সাধনায় ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধির প্রতিই এদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সহজয়ানীদের ধর্ম সাধনায় 'সহজ' শব্দটি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দুটি সার্থকতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একটি হ'ল এই ধর্ম সাধনার সাধ্য সহজ এবং অপরটি হ'ল সিদ্ধাচার্যদের সাধনপদ্ধতি বক্র নয়—সহজ (জন্মের সহিত জাত) দেহ। অন্যান্য সাধকেরা ধ্যান-জপ-তপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করে মুক্তির সন্ধানী হয়েছেন। কিন্তু চর্যার গীতিকারগণ সহজ দেহের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা না করে, ধ্যান-সমাধির ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন। আপনাদের পাঠ্য তালিকার লুইপাদের ১ম সংখ্যক পদে তার পরিচয় আছে।

"স অল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখে দুখেতে নিচিতি মরি অই।।"

প্রায় একই সুর ধ্বনিত হয়েছে ২৯, ৩৪, ৪০ সংখ্যক পদেও। আগম পুঁথি সবই মিথ্যা, ইন্দ্রিয়গোচর ও গ্রাহ্য সব কিছুই নিষ্ফল। কিন্তু সহজানন্দ ইন্দ্রিয় গোচর নয়। চর্যার 'সহজ' ও 'সহজলাভের' ঋজু পথ—সাধারণ মানুষ জানেনা। এই দুই এর সঠিক পরিচয় একমাত্র গুরুর কাছে পাওয়া যাবে। তাই চর্যার কবি বলেছেন—

"গুরু পুচ্ছিঅ জান।"

চর্যাগীতিতে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে সহজিয়া ধর্মের সাধনপ্রণালী অনেকটা প্রাধান্য পেয়েছে। তন্ত্রে ধর্ম সম্পর্কে কোনো